

# আমাদের স্বাধীন কলম

১৪২৮





## সূচিপত্র

অঙ্কনপ্রবাহ.....	3
খোয়াব.....	4
একটা দিন.....	6
টিক্ টিক্ টিক্.....	8
কিন্নর.....	9
সিসিফাসের পাথর.....	11
সত্যি.....	13
শুধু কথা হয় না আর.....	14
শব্দপ্রবাহ-১.....	15
নির্বাক.....	16
তোমাকে, তোমাদের সবাইকে.....	17
অব্যক্ত.....	20
দার্শনিকের যেকোনো উদ্ধৃতি.....	23
এক বন্দিণীর আতর্নাদ- ক্ষীরের পুতুল নহে বারুদের স্তূপ.....	25
শব্দপ্রবাহ-২.....	28
ইতিহাসের রোদ্দুর.....	29
বেকার স্টাম্প.....	31
ক্লাসিক্যাল পোয়েট্রিক্স ও তার প্রারম্ভিক নির্মাণ.....	34
এবং তুমি.....	38
ইতি অশ্ব.....	39



## অঙ্কনপ্রবাহ

সুশোভনা ঘোষ	10
সুশোভনা ঘোষ	22
আত্রেয়ী হালদার	33
আত্রেয়ী হালদার	প্রচ্ছদ

## শব্দপ্রবাহ

শব্দপ্রবাহ-১ ...পার্থপ্রতিম রায়	15
শব্দপ্রবাহ-২ ...সোহিনী সরকার	28

পৃথিবী যখন মারণব্যাপির কবলে ক্রমাগত ধুঁকছে, সেই করাল থাবার সঙ্গে প্রতিমুহূর্তে যুদ্ধে চলেছেন চিকিৎসকরা। এই বৈশাখের উৎসবমুখর দিনগুলো ডুবে যাচ্ছে নিস্কলিতার অন্তরালে... শারীরিক দূরত্ব যেখানে রোগমুক্তির পথ, তখন আমাদের এই প্রচেষ্টা দূরে থেকেই কাছে আসার। শুধু বাঙলা ভাষাভাষী মানুষরা নয়, শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র মানবজাতি এই অতিমারীকে হারিয়ে সুস্থ পৃথিবীর দিকে যাত্রা আরম্ভ করেছে। কিছুদিনের সাবধানতা অবলম্বন যদি আবার ফিরিয়ে আনতে পারে স্বাভাবিক এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকাল, তবে তাই হোক না। আসুন, একবার হাতে হাত না রেখে যুদ্ধজয় করি।

বাঙালীর চিন্তনে, মননে, বাঙালীর গৃহস্থলি থেকে শিক্ষার আঙিনা, প্রতিটি কোনায় যে মানুষটির ছোঁয়া; যে মানুষটির কবিতা, গান শুধু নয়, জীবনদর্শন বারবার বাঙালীস্বত্বকে জাগিয়ে তোলে, তিনি হলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আজকের বর্তমান পৃথিবীর পরিস্থিতি বেশ জটিল, শীতঘুমে ডুবেছে সমগ্র ভারত। প্রতিদিন মৃত্যুমিছিলে সামিল হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। দুঃখই যেন চারপাশে ঘিরে রেখেছে। সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠা দুঃখ, মহামারীর মধ্যে সুখ খুঁজে নেওয়া বড় কঠিন। এখানে বোধহয় কবিগুরুর জীবনদর্শন আমাদের ভাবতে শেখায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জীবনের সবচেয়ে ছোট জিনিসগুলি থেকে যে সাহিত্যরস বারবার তুলে এনেছেন, যেভাবে সন্ধান দিয়েছেন আনন্দের, সুখের, তা যেন বারবার আমাদের ভাবিয়ে তোলে এখন। বারবার বলে, আমরা এখনও হারিনি। সত্যজিৎ রায়কে একবার একটি খাতায় তিনি লিখে দেন,

"বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে  
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে  
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা  
দেখিতে গিয়েছি সিঙ্কু।  
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া  
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া  
একটি ধানের শীষের উপর  
একটি শিশির বিন্দু।।"

সত্যিই তো তাই; চারপাশের সমগ্র পৃথিবীর প্রতিটি কোনায় কোনায় যখন দুঃখ, প্রতিটি কোনায় কোনায় যখন মানুষের হাহাকার, তখন ওই একটি ধানের শীষের উপর পড়ে থাকা একফোঁটা শিশিরবিন্দুই হয়তো আমাদের ভালো থাকার সম্বল। তাই থেকেই জীবনের বাঁচার রসদ জোগাড় করতে হবে। তাই তিনি শীতকালে ঝরাপাতার মধ্যেও শান্তি পেয়েছেন। বলেছেন, "ঝরাপাতা গো, আমি তোমারই দলে..."

  
.. দেবার্ঘ্য



## খোয়াব ...শিঞ্জিত

এ জমির প্রতি অভিযোগ নেই  
অভিমান আছে শুধু ...  
এ জমিতে কোনো ফসল ফেলেনি  
স্বপ্ন ধূসর ধূধু ।

এ নদীর পাশে শহর হয়েছে  
শহরে বেড়েছে পেট  
এ নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে যুবক  
প্রতিদিন বিচ্ছেদ ...

এ আকাশ ঘন রক্তের ছাপ  
মেঘেতে লুকোয় রোজ  
এ আকাশে হায় লাশের তালাশে  
দিতে হয় উৎকোচ ...

এইটুকু থেকে এত বড়ো হওয়া  
জীবনের অপচয়  
হয়তো খোয়াব , তবুও দেখাবো -  
মানুষেরই হবে জয় ...

## একটা দিন

### ...কৌশিকী ভট্টাচার্য

একদিন। একটা দিন। মাত্র একদিনে। কোনো এক দিন...

একটা ভিজে অশ্বথ গাছের তলায় ডিলান বসেছিলো। ডিলানের ঠিক উল্টোদিকে সঁধিয়ে গ্যাছে হলুদ আর গোলাপী রঙের আকাশ। আকাশটাও ভিজে জবজব করছে। ডিলান বিরক্ত। মশা আর কি একটা সবুজ পোকা, অথচ দৃশ্যটা হলুদ - গোলাপী ক্যানভাস জুড়ে আঁকা এক প্রাচীন পোর্টুগীজ নাবিকের মত। ডিলান উদাসীন। অসহায়। ডিলানের হাতে বেহালার বাত্মটা স্থির হয়ে যাচ্ছে ভিজে। পাহাড়ের ওপরের বাড়িটায় যাবে সে। ডিলান চমকে উঠতে গিয়েও পারলোনা। কেঁদে ফেললো।

এবার মেঘমালা। জানলার গরাদে মেঘ এসে দাঁড়ায় আর নরম হাওয়াই মিঠাইয়ের মতো হাত বাড়িয়ে ডেকে ন্যায় ও।

ওর লম্বা চুলের শেষ ডগাতে তখন রোদুরের সোনালী হিংসে খসে যাচ্ছে। পাখির ডাক শুনে ও বিহ্বল হয়ে রইলো খানিকক্ষণ। চিঠির ডাক পড়েছে। ওর খামের ভেতরে সুগন্ধ ক্যামন। ও শান্ত হয়ে বসলো বিছানায়। বসেই রইলো...

একটা মেঠো কাঠফাটা সূর্য সমস্ত গা জ্বালিয়ে দিচ্ছে। বিন্দি ওর বাচ্চা কোলে নিয়ে ফিরছে ঘরে। আরেক কাঁধে জলের ঘড়া বাঁকে করে ঝোলানো। ঘরে ঢুকেই আগে চড়ুইগুলোর ডানা কেটে ফেলে রাখবে ধুলোয়। প্রতিদিন ধুয়ে রাখা চালে মুখ দায়। ঘরের কাছাকাছি আসতেই দেখলো শাবন হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে। অবাক বিন্দির তখন সব রাগ গলে জল।

ডিলান সেদিন দেখেছিলো পাহাড়ের মাথা থেকে ওর সন্তুরে বাবা নিতে এসেছেন ওকে। সাত বছর বাইরে থেকে ফেরার পরেও, আশ্চর্যজনক ভাবেই ওর বাবা ভুলে যায়নি ছেলের ছাতা সঙ্গে না রাখার অভ্যেসটা।

মেঘমালা সফল ব্যবসায়ীর মেয়ে। কিন্তু তার বাবা রাত্রি হলে বদলে যেতেন। ওর নরম শরীরের জন্য ক্ষতিকর। সেদিন মেঘমালার জীবনের মুক্তি। ও একটা চাকরি পেয়েছে, চলে যাবে ও...

বিন্দির টা জানিনা। খোঁজ খবর নিলে ডিলান আর মেঘমালারটাও কতোখানি মিলবে  
সন্দেহ আছে! আর একটা দিন আছেই। কোনো এক দিন আছে। যে দিনটার জন্য বাকী সব  
দিন। বাকী সবকটা দিনে ওই একদিন টা কে খুঁজে পাওয়ার একটা হাড্ডাহাড়ি যুদ্ধ চলছে।  
হয়তো ডিলান দেখেছিলো একটা ল্যাজঝোলা ফিঙে, হয়তো বিন্দির... না বিন্দিরটা  
জানিনা।



## টিক্ টিক্ টিক্

...মহ: জাহিদ আখতার খান

অনেক অনেক চেষ্টার পর  
অল্প কয়েকটা শব্দ,  
ধাক্কা দিয়ে বমির মতো উগরে আসে।  
প্রশান্তি নেই, নেই কোনো অনুভূতি,  
নেই দুঃখ,  
নেই ভারী হয়ে আসা কোনো সজল দীর্ঘশ্বাস।  
গুমরে মরিনি বহুদিন, "বীরত্ব" দেখাইনি বহুদিন;  
ভালোও বাসিনি যেন, অনেকটা দিন হল।  
অনেকটা দিন, অনেক অনেকটা দিন।  
চারিদিকে শুধু হাসির ছড়াছড়ি  
বড়ই শুষ্ক, বড়ই কার্শ, বড় বেশি অপ্রাসঙ্গিক।

এক পা, এক পা, একদিন, একদিন...  
টিক্, টিক্, টিক্, টিক্, টিক্.....

বাজার বেশ গরম দাদা, আরো গরম সোশ্যাল মিডিয়া,  
তার চেয়েও বেশি গরম "যুক্তিভিত্তিক বিচার বিশ্লেষণ"।  
লক্ষ, লক্ষ, কোটি, কোটি, টাকা, টাকা,  
শুধু টাকা, শুধুই বারমুডার ক্ষুধার্ত গর্জন।

টিক্, টিক্, টিক্, টিক্, টিক্.....

মহীর সমুদ্রে হাবুডুবু খাই, দম বন্ধ হয়ে আসে।  
সত্যিই তো!  
সত্যিই তো একদিন বন্ধ হয়ে আসে!!!

টিক্, টিক্, টিক্, টিক্, টিক্.....



## কিন্নর

### ...আসাদ মল্লিক

একটা নদী। কান পাতলে ধুকপুকানি শুনতে পাওয়া যায়। খানিক দূরে নৌকায় দু'চারটে লোক, হাঁটুর উপর লুঙ্গি। হ্যাজাক জ্বলছে পাশে। ওপরের অন্ধকারের ছায়া পড়ে স্রোতে। সব গ্লানি ধুয়ে যায়। সব কষ্ট ধুয়ে যায়...

ঘৃণা করতে ভুলতে গিয়ে মানুষ হয়ে উঠেছে ও। ওর বাড়ি নেই। একটা ফড়িং পোষ মেনেছে ওর। এক দেওয়ালের নোনাইটের মাঝে ও থাকে। ভোরবেলা ঠান্ডা বিছানা ছেড়ে উঠে যায় ও। চাদরে লেগে থাকে গলে পড়া চামড়া...

কাশবনে পাহাড় লুকিয়ে পড়ে। উদাসী পথের শেষে স্তবক ছড়িয়ে থাকে। অজান্তেই জানলার ডাকে পাশ ফিরলে চোখে চোখ পড়ে যায়। পড়ে আসা রোদে মুখটা মায়ায় জড়িয়ে নেয়। মন আবদ্ধ হয়ে যায় কেমনভাবে, জানি না। বুঝতে চাইলেও বোঝা শক্ত। শুধু ফড়িং এসে দিবাস্বপ্ন ভেঙে যায়!

একরাশ অভিমান জমে জমে সিঁড়ি তৈরি হয়। বিষণ্ণ রাগ মনকেমনের খাতা খোলে। মেঘমল্লারে বৃথাই জল ঝরে। ভেজে না শালিক-চড়ুই। আঁচল ভিজিয়ে কোনো ষোড়শী হেঁটে যায় না মেঠোপথ ধরে। এ শ্রাবণ শুধু বারুদের গন্ধ ধুতে কাজে লাগে...

জ্যোৎস্নার তীব্রতায় বেয়নেট ঝকঝকে। অবাক নদীর পাড়ে খিলখিলিয়ে হাসে থিদে। সে থিদের ভাষা নেই। আঙ্গুল থেকে মাথার শিরা, পিটুইটারি থেকে অলিন্দ পচতে থাকে সবকিছু। গুটিয়ে ছোট হয়ে কুঁকড়ে যায় শরীর। নদীর স্বর বুজে আসে। নোনাধরা দেওয়ালে টিকটিকির বাসা। তার সাদা ডিমে নতুন প্রাণের আভাস পাওয়া যায়...



সুশোভনা ঘোষ



## সিসিফাসের পাথর

...রিমা শিকদার

১.

বড় আর অভাবের সংসারে মায়া, মমতা, আদর, ভালোবাসা, মাছ, মাংস এইসব স্নেহজাতীয় খাবার প্রকট থাকে না, থাকে পাথর চাপা ঘাসের মতো, হলুদ হয়ে; তবে কখনো মরে না। সুখে বা অসুখে, শোকে বা মৃত্যুতে, জন্ম বা বিবাহে, উৎসবে বা পরবে বা এই জাতীয় নানা অবস্থা বা মুহূর্তে, খুব মাঝে মধ্যে সেই পাথর সরে যায়। আর সেই পাথর সরানোর ভার থাকে চিরদিন সিসিফাসের কাঁধে।

২.

মানুষ কখনোই স্বাধীন হয় না, কারণ বাস্তবে সে কখনোই স্বাধীনতা চায় না। স্বাধীনতা মানুষকে আত্মনির্ভর হতে বলে। আর মানুষ হেলান দিয়ে থাকতে পছন্দ করে।

৩.

একদা এই অঞ্চলের মানুষের গোলাভরা ধান ছিলো, পুকুরভরা মাছ ছিলো। এই কথা যেমন মিথ্যা, এই অঞ্চল একদা অসাম্প্রদায়িক ছিলো সেটাও মিথ্যা। কারণ গোলাভরা ধান আর পুকুরভরা মাছ যেই শ্রেণির মানুষের ছিলো এখনো সেই শ্রেণির মানুষেরই আছে। গরিব বরাবরই গরিব। তেমনই এই অঞ্চল শুরু থেকেই সাম্প্রদায়িক। বিষয়ের স্বার্থে মানুষ অসাম্প্রদায়িক আচরণ করে একটা সময় পর্যন্ত। সাম্প্রদায়িকতা কোনো পোশাক নয় যে মানুষের গায়ে পরিহিত অবস্থায় থাকে, সাম্প্রদায়িকতা থাকে মানুষের মগজে। চূড়ান্ত সময়ে সেটা বরাবরই কলেরার মলের মতো মাথা থেকে বের হয়ে আসে। যদি এই অঞ্চলের মানুষ শুরুতে অসাম্প্রদায়িক থাকতো তাহলে কখনোই রায়ট হতো না, দুইজাতি তত্ত্ব হতো না, দেশভাগ হতো না।

৪.

নারীবাদকে আঠারো-উনিশ শতকের মাত্রায় জাপটে ধরে বিকাশ করলে তার মাত্রাতিরিক্ত ফল হয়। আর নিশ্চয়ই মাত্রার অতিরিক্ত কিছু হিউম্যান কাইন্ডের জন্যে কল্যাণকর নয় তা প্রমাণিত হয়েছে। তাই নারীবাদও ধর্মের মতোই, দেশকালের কনটেক্সটে সেটার ভারসাম্য বজায় হবে।

সুতরাং, তসলিমা বা নাদিয়ার নারীবাদ বা পশ্চিমা নারীবাদকে ক্যাথারসিস না করে গোড়া থেকে সব থিওরি পড়ুন এবং তাকে দেশকালের কনটেক্সটে ব্যবহার করুন। থিওরি জানাটা কিন্তু অত্যাৱশ্যক। কারণ ইনট্যুইশনের যুগ বহুযুগ আছে শেষ হয়ে গেছে। নারীবাদ দেখে শেখার বিষয় নয়, ফ্যাশান কিংবা ক্যান্ডিফ্লসটাইপ মিঠাইও নয়। এটা পড়ালেখা ও চর্চা করে ধারণ করার বিষয়। উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট বলতে নারীর ক্ষমতায়ন বোঝায় না, বোঝায় সমতায়ন। যোগ্য হলে ক্ষমতা পায়ের কাছে এসে পড়ে। জোর করে ক্ষমতা নিলে লোকে হাসে। গোপনে বলে যে ‘পুরুষের কান্দে দাঁড়ায়া ভাষণ মারে...’ ইত্যাদি।



## সত্যি

... সৌম্যদেব

আমি জানি  
আমি জানি তুমি চলে যাবে  
সেই সত্যিটা জেনেই তোমায় ভালোবাসি।

কেন?  
মৃত্যুও তো সত্যি।  
তাই বলে কি বাঁচতে চাইনা বলো?  
মিথ্যে অর্থের লোভে  
খুনোখুনি, রাহাজানি, দাঙ্গা...  
বলো, করিনা আমরা? করিনা?  
সেসব নৃশংসতার মাঝে,  
আমি তো নিছকই এক তৃতীয় বিশ্বের কবি!  
আমি যে নিছকই তোমায় ভালোবাসি  
ভালোবাসতে চাই।

## শুধু কথা হয় না আর

...অরিত্র (Erick C.)

সবই আছে আগের মতো।  
শুধু কথা হয় না আর।

আজও হাতে ফোন নিলে আঙ্গুলটা ভুল করে নম্বরটা ডায়াল করে ফ্যালে।  
আজও স্ট্যাটাসের ভিড়ে একটা নামই চোখে পরে।  
আজও নোটিফিকেশনের আওয়াজ শুধু একটাই নাম খোঁজে।  
শুধু কথা হয় না আর।

আজও social media ঘাঁটাঘাঁটি হয়।  
আজও লুকিয়ে সব ছবি save হয়ে যায়।  
আজও দুজন দুজনের সব খবর রাখে।  
শুধু কথা হয় না আর।

আজও দেখা হয় দুজনের রাস্তার মোড়ে।  
আজও চোখে চোখ রাখে দুজন দুজনের।  
আজও হাতের আঙ্গুলগুলো আগের মতোই মিশে যেতে চায় পরস্পরের হাতে।  
শুধু কথা হয় না আর।

আজও কাছে যাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা চলে।  
আজও একটা 'Hi' বারবার লেখা হয়।  
আজও ব্যাকস্পেসটা বারবার জিতে যায়।  
তাই, শুধু কথা হয় না আর।

সবই থেকে যায় একইরকম।  
শুধু... কথা হয় না আর।



## শব্দপ্রবাহ ১

নূতনের আহ্বানে সাড়া দিয়েই পুরাতন জরাজীর্ণ, রোগাক্রান্ত আত্মা নবযৌবন লাভ করে। অতীতের সকল বেদনা, হতাশা কে অতিক্রম করে জীবনতরী র নোঙর এক অজানা দীপের সান্নিধ্য পেতে চায়, যে দীপে নতুন দিনের উচ্ছাস প্রতিটি জীবের অন্তরাত্মাকে প্লাবিত করার জন্য মুখিয়ে থাকে। অরণ্য, নদ নদী, সমগ্র প্রাণীকূল নিজেদের স্বরূপ ধারণ করে, যার থেকে পবিত্র বোধ হয় আর কিছু হয় না। সেই নতুন দিনের ডাক দিয়েই কবিগুরু পরমাত্মার আদরের সন্তান ধরণীর নবীকরণ চেয়েছেন।

...পার্থপ্রতিম রায়

Link to song:

<https://drive.google.com/file/d/1kwyZWxOA5gg6Xu28AGT0EhXc3a39AlGt/view?usp=sharing>



## নির্বাক

### ...প্রমথেশ ভূঞা

সূর্য ডুবছে,  
এর অপার মহিমা বর্ণনার সময় এখন আমার নেই!  
আমাকে এখন যেতে হবে সদ্য অকাল বিধবা হওয়া মেয়েটির কাছে,  
বাধ্য হয়েই মিথ্যে সাত্বনা দিতে হবে তাকে!

তারপর আমাকে যেতে হবে এক সদ্য বিরহিনীর কাছে,  
তাকে উপহার দিতে হবে জীবনানন্দের কাব্যগ্রন্থ!

তারপর আমি যাবো সারাদিন ধরে ঘুড়ি ওড়ানো ছেলেটির কাছে,  
তার কাছে নেবো ধৈর্যের পাঠ!

তারপর ফিরবো!  
ততক্ষণে সূর্য ডুবে যাক!  
সন্ধ্যা হোক!  
শান্ত আমি লিখে যাবো এমন অভিজ্ঞতা আমার পাণ্ডুলিপিতে!  
তারপর হবো নির্বাক!



## তোমাকে, তোমাদের সবাইকে

...হিন্দোল

১

অথচ আজ একটি কবিতা লেখা উচিত,  
কেনো না আজ সন্ধ্যার আকাশ ছিল নীল—  
কেনো না আজ গভীর নদীর বুকে উঠেছিল ঝড়—  
কেনো না আজ নির্জনতা— নির্জনতা সাক্ষী—  
মরা বেড়ালের মতো শব্দ করে সীমান্ত দরজা বন্ধ হলো— শুনতে পাচ্ছিলাম, শুনতে  
পাচ্ছিলাম  
কয়েক টুকরো কাঁচ ভাঙা অশান্ত পদক্ষেপ—  
কেনো না ওই সমস্ত পদস্থলন শুকনো নক্ষত্র দীঘির  
অন্তিমতম জলবিন্দুকে গুঁড়িয়ে দিলো অবলীলায়।  
তাই আজ— আজ একটি কবিতা লেখা খুব প্রয়োজন।

২

অন্য কথা বলবো?  
আচ্ছা বেশ, আমরা তবে নক্ষত্রকেন্দ্রিক কোনো আলোচনা করি?  
কিংবা এই শুকিয়ে যাওয়া রাত— হ্যাঁ, মানছি  
পৃথিবীর সমস্ত দোষ আমার— তবু এই শুকিয়ে যাওয়া অন্ধকার—  
অন্য কথা বলবো?  
তাহলে, ঝড়ের কথা বলি? ইদানিং রোজ ঝড় উঠছে, মেঘ নেই, হাওয়া নেই, গাছও যে খুব  
বেশি আছে তেমনটাও নয় তবুও ইদানিং—  
অগণন ঝড় ধেয়ে আসছে কোলকাতায়।  
ঝড়ের ধাক্কায় উড়ে যাচ্ছি আমি— আমাদের থেকে বহুদূরে—  
অন্য কোনো কথা বেঁচে নেই আর।  
সমস্ত কথা আমি হারিয়ে ফেলেছি।

৩

কোলকাতার বারান্দায় এখন প্রায় ভোর,  
সিগারেট শেষ;  
মুখোশ খুলে আজ আবার অন্ধকারে বেরিয়ে এসেছে

দুই পিশাচ পিশাচী—

সামনের রাস্তায় তারা ছড়িয়ে দিয়েছে বমি— টকগন্ধ মিশে গেছে করুণ বারান্দা জুড়ে।

সিগারেট শেষ হয়েছে তবু, তুমি জানো, কথাগুলো দারুণ পোড়াচ্ছে আমায়;

এই প্রদহ থামবে না সহজে— যদিও আমি জানি,

সমস্ত অপমান ডিঙিয়ে বেঁচে থাকবে কবিতা,

বেঁচে থাকবে আমার মা।

তুমি, তোমরা যতই ছড়িয়ে রাখো বমি, মনের ময়লা,

মুখ খুলে যতই উড়িয়ে দাও গুঁয়ের মাছি,

আমি জানি, তুমি কিংবা তোমরা— কেউই পারবে না এই শাস্ত্রত বেঁচে থাকা থামিয়ে দিতে।

৪

আমাদের এক পা নর্দমায়,

আমাদের অন্য পা ভ্রেনে

আমাদের এক হাত জানোয়ার

অন্য হাতকে চেনে।

আমাদের এক মুখ গন্ধ

আর অন্য মুখে ছাই

আমাদের এক বুক ঘৃণা

বন্ধু অন্য বুক ফাঁপা

আমরা চোখে চোখ রাখি

কিন্তু গভীরে লড়াই।

৫

আজকের বেদনা নিখুঁত,

দ্যাথহীন কণ্ঠে স্বীকার করে যাই।

যত সহজে পাখি উড়ে যায় গাছ ছেড়ে— আমি পারিনি।

যত সহজে নদী ভুলে যায় তীরবর্তী ঘরবাড়ি—

আমি পারিনি।

আজকের বেদনা সত্য—



যেমন সত্য এখন কোকিল আর কাক যুগপৎ ডাকছে—  
কিংবা এইমাত্র নিভে গেলো রাস্তার আলো।  
কোলকাতার আকাশে এখন মিঠেখালী ভোর,  
স্বীকার করি, আজকের দৃশ্যাবলী সত্যিই দারুণ কিন্তু  
আমাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে।

৬

এভাবে কবিতা লেখা যায় না।  
নিশ্চল জানলার দিকে চেয়ে আছি—  
কাঁচ চিরে ঘরে ঢুকছে ভোরের আলো,  
জানলার ওপাশে রাস্তায় সাইকেল যাওয়ার আওয়াজ পেলাম;  
আবার থামছি, কী যেনো ভাবলাম?  
কার মুখ যেনো মনে পড়লো!  
তার নাম আমি জানি, লিখে দিই তাহলে শেষ লাইনে পৌঁছে?  
প্রকাশ করে দিই, এমন অজর ভোরে যে নারীর মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে!

সে আমার প্রেমিকা নয়...

৭

চোখ বন্ধ করলে সমস্ত পাখি ঘরের ভিতরে চলে আসে,  
চোখ খুললে দেখি আধুনিক দেয়ালে সেটে আছে  
ধূসর সুইচবোর্ড, সকেট—  
একটা অলআউট জ্বলছে।  
চোখ বন্ধ করলে পাখি, চোখ খুললে অলআউট—  
এই তো নাগরিক জীবন!

## অব্যক্ত

### ...নির্ব্যক্ত

প্রিয় বান্ধবীকে চিঠি,  
শরীরে হারমনি হচ্ছে  
এখন প্রয়োজন নেই।  
সিলিন্ডার এনে দেবে কে?  
পুরে রেখে দেব সাতটা সুরের  
ভাঁজ-শুদু।

কথারা কথামতো চললে মানুষের বয়সকালের অর্ধেক সমস্যার এমনিই সমাধান হয়ে যেত।  
কিন্তু কথাদের চরিত্রই রীতি-নীতির ভাঙন ধরানো।

"সমস্ত বিষাদ লুকিয়ে থাকে যত্নঘেরা অন্ধালায়ে।"

---আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল সীমাবদ্ধ কথাপ্রমুখের। কেউ দরজা অবধি আসতো, কেউ কেউ না বলে বিছানায় উঠে যেত। যারা আহত ছিল, তাদের আমিই বহন করে আনতাম আমার শক্ত জাজিমের বিছানায়। কেউ আমার কাছে পথ্যের দাবি করেনি, কেউ কোনোদিন বিছানায় আদর করতে চায়নি আমায়। শুধু প্রবেশ করেছে আমার শরীরে। শিশ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখিনি তাদের; পাশে বসে ছুঁয়ে গেছে কপাল আর চিবুক। কথাদের সাথে রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হয়েছি অনেক দুপুরে, যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। চিতা-কবর-কফিন তিনদিকে আড়াল করে রেখেছে আমায় সেসব দিনে, আমি ক্ষুধার্ত হায়নার মত ছিঁড়ে খেয়েছি কথাদের দেহ, সমস্ত রকম বন্যতার শিকারে বেঁধে ফেলেছি কথাদের। সেসব দুপুরে শীৎকারের সাক্ষী থেকেছে জানলার ধারের বৃক্ষ। আদ্যপান্ত মানুষের মতোই জীবন্ত ছিল সেসব কথা'রা।

কিছু কিছু গাছ আছে তাদের ছাল ছাড়িয়ে নিলে রেজিন পাওয়া যায়। আমার দেহবর্জিত রেজিনের গন্ধ, কথাদের সম্পূর্ণভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়া দেহ আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে প্রতিবার। আমি ক্লান্ত হইনি কোনো দুপুর-রাত্রে। আস্তে আস্তে আমার অত্যাচারে কথারা আসা বন্ধ করে দিলো দুপুরে। আমি উন্মাদ হয়ে গেছিলাম। কথাসঙ্গমের উন্মাদনা কোনো মানব কিংবা অঙ্গরা দেহের দেহাতীত। ছুঁতে পারছি না কথাদের; শুনতে পাচ্ছি কোনো দূর দিগন্তে সর্বনামের সুরে।



কথোপকথন কথাদের দেশীয় ভাষা। ভীষণ নার্সিসিস্ট রাতগুলোয় বন্ধুরা দরজার কাছে এসে ডাকে। চিৎকার করে, তাদের স্লোগানের কথাগুলো আমি ভুলতে পারবো না! আমরা কারা? আমরা দেশের বাড়ি যাবো! আমায় দু'মুঠো বীজ এনে দাও, চানাচুরের মত। বৈঠকখানায় এসে চায়ের সাথে দুব্বো ঘাস খাবে তারা। তাদের প্রশ্নে জর্জরিত হয়ে হাতে-পায়ে ব্যাথা করে আমার।

"আমাদের দেশ কোথায়, আমরা কেমন করে গান করবো? তোমার বাথরুম থেকে পাশের বাড়ির ছাদ'টাকে কেমন লাগে নির্বেদ?"

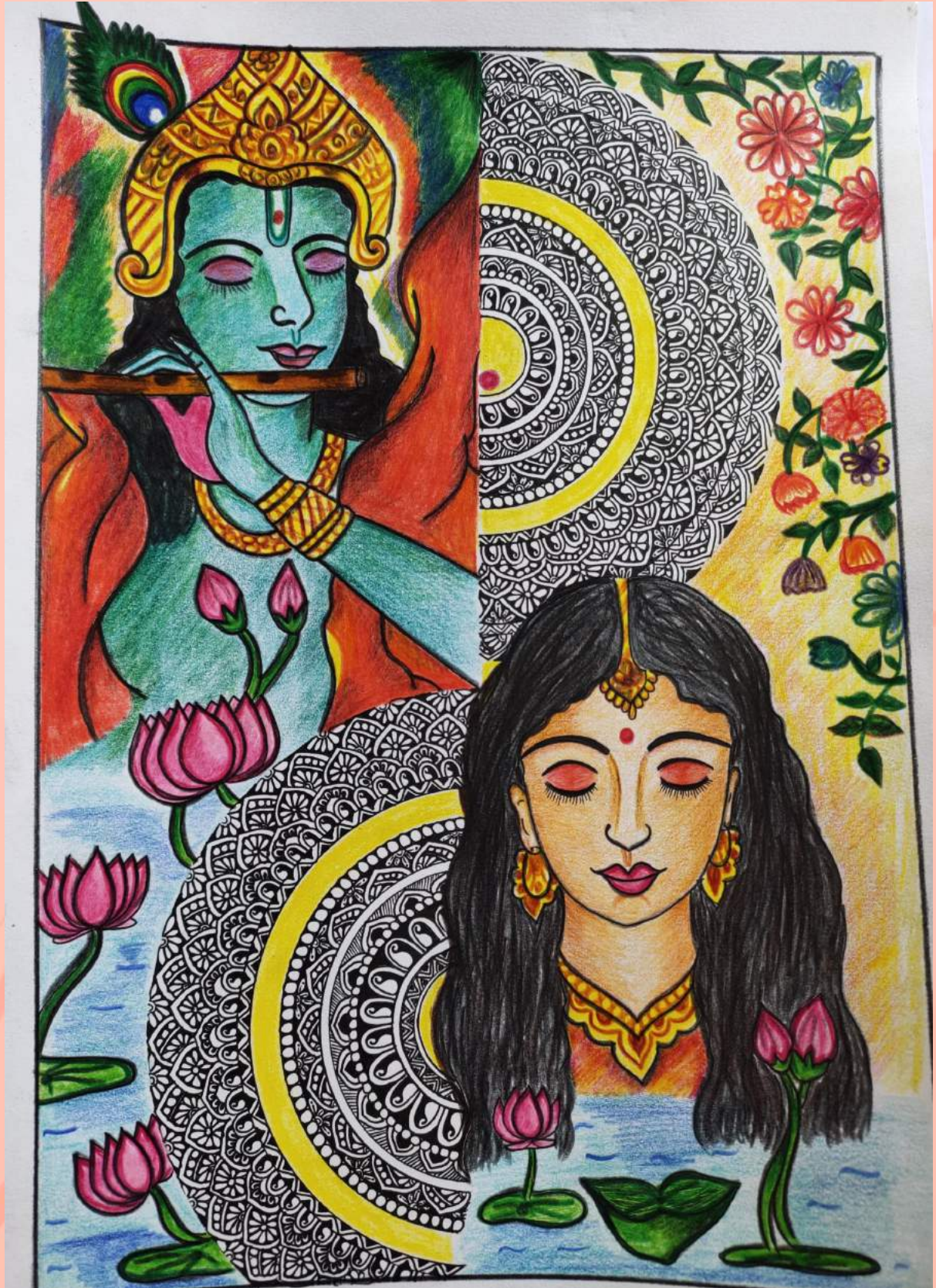
অসংখ্য প্রশ্নে আমার ভয় লাগে। ভাবতে থাকি কি করে এড়িয়ে যাওয়া যায়। আমরা সজাগভাবে এড়িয়ে যেতে চাই, ঠিক যেভাবে ট্রেনে ভিথিরী এড়িয়ে যাই। কিন্তু ভিথিরিটাও কি সেভাবেই এড়িয়ে যায় পয়সা না দেওয়া বাবুদের? অবশ্য মাত্র একটা টাকার জন্য দুঃখ পাওয়া কখনোই যথাযথ নয়। কিন্তু তা'হলেই কি প্রশ্ন ফুরিয়ে যায়, নাকি চাপা পড়ে যায়? যেভাবে ভালোবাসায় স্ত্রী-পুরুষের যৌনাকর্ষণ চাপা পড়ে যায়!

সেই চাষীর কি হলো, যার আজকে সন্ধ্যাবেলায় শ্যামাসঙ্গীত গাওয়ার কথা ছিল? সেই আরশোলা দেখে ভয় পাওয়া মেয়েগুলো কোথায়? যারা খুব সুন্দর রুটি বানাতে পারতো? তাই'কি আরশোলা প্রজাতি অস্তিত্বসংকটের জেরে ধীরে ধীরে অবলুপ্তির দিকে চলেছে! আমি উত্তর খুঁজে চলেছি। সেই চিন্তায় জামাকাপড় পড়েই স্নান করে ফেলছি, স্বাধীনতা দিবস মনে পড়ছে না। সবাই অসুস্থ হয়ে সুস্থ হচ্ছে; আবার অসুস্থ হয়ে পড়ছে। পৃথিবীর প্রতিটা ধূলিকণায় নাম লেখা হচ্ছে, সব'টা মানুষের নামে, একেকজনের নামে এক এক মুঠো ধূলিকণা।

কাদাজলের মালিক নাই? মেয়েরা আর সংসার সাজায় না? চাষীদের লাঙ্গল-জমি আছে? কুকুরেরা এখন দুপুরে ঐটো কুড়োতে আসে? সাঁওতালেরা সুস্থ আছে নিশ্চয়; তারা তো মানুষ নয়!

সাঁওতাল, ভীল, জারোয়ারা ভালো থাকুক। সুস্থ থাকুক।





সুশোভনা ঘোষ



## দার্শনিকের যেকোনো উদ্ধৃতি

...সমন্বয়

অনুপস্থিতিই খুঁজি। হয়তো আমিই খুঁজি। আমি না খুঁজলেও তুমি তো আছো। তুমি ঠিক বসে আছো। অন্ধকারে রূপালি সাপের মতন। চোখদুটো। প্লাস্টার খসা দেয়াল। মুখে শীতের ছুলি। একটা বেঞ্চ। যার গায়ে মহাকালের বাটাল হু হু করে চলে গেছে। এসব ছবিতে। চোখদুটো বেরিয়ে আসে তোমার। চোখের বাইরে থেকে। উরুতে ঠান্ডা হাত রাখার মতন। আরাম।

একটা আম দিন। সাধারণ। গ্রীষ্মেরও হতে পারে। তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে। পালালি কেনো? ভয়ে। তত্ত্ব মাথায় খেলে যায়। ওটাই তো আদি। ওর থেকে তফাৎ এ যতটুকু, ততটুকুই জীবন। এছাড়া জীবনের কিছু? বাদামি জরায়ুতে ছিলাম। চোখ ফোটেনি। তাই কালো। বাইরে এনেছে কী আনেনি শুরু কান্না। মশাদের সাউন্ড মাঝে মাঝে ভৌতিক। ঝাঁঝালো আলো। লঙ্কা বুদ্ধি ভূত তারায়। চোখ জ্বলেছিলো। কান্না। গাছ পাহাড় গাছ পাহাড় গাছ গাছ। কান্না। আলো ভয় করি। সেকারণে ঈশ্বরের পেছনে হ্যালো করে দিয়েছি। ঈশ্বর, ভয় করি।

শহরে, শহরে। নিজের অনুপস্থিতি খুঁজেছি। সাদা নীল বোরখায় নিজেকে ভেবে নিতে পারি। মাইরি বলছি। অসুবিধা হয়নি। সেদিন প্রদর্শনীতে। বোমে উড়ে যাওয়া শহরের সাদা কালো ছবি। মহাকাশ নেমেছে ভূমিতে। লুকিয়ে হাত বুলিয়েছি আমি একটা কঙ্কালে। যেভাবে ম্যাপ আঁকা যায়, সেভাবেই। শিহরণ শিহরণ! আমি মৃত হতে পেরেছি অবশেষে!

ভয় বোঝো। একটা দেয়াল, করো। হাঁটো অন্ধের মতন। অগভীর জলে মাছ চলে গেলে যেভাবে ছেড়ে যায় রেখা। এই রেখার মতন। ফুড়ুং হয়ে যাও। তবে দেয়াল একটা কোথাও আছে। ধাক্কা। সাদা পরিবেশে কালো তুলো উড়ছে। একটা গরুর মরা চোখদুটো আকাশের কালো গর্তটার দিকে। বলছে, "তোকে কবিতায় এতো পাত্তা দেওয়া ঠিক হলো না"। এবারে বসো। বোঝো, ভয় আদতে বাইরেই থাকে। আর জোর ধাক্কাটাকে তুমি ভুল নাম দিয়েছো।

একটা বিল্ডিং-এর ভাঙা কাঁধ। শেয়াল কুকুরে খাওয়া। চুকেছিলাম। চাপ চাপ মেরুন রক্ত। বাথরুমে। একটা অন্ধকার অরিজিন। হোল। হিশু করলাম। লম্বা চোখে একটা দীর্ঘ রাস্তা। পোঁদে লাল আলো ঝুলিয়ে বাইক টাইক হুস হুস করে উড়ছে। আলোর একটানা

ছায়ারেখা পেছনে ফেলে। হিশুর ফোঁটাও তেমন। হালের মধ্যে যেতে যেতে সরু শব্দ হলো।  
সামনে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে উটের মাথা। বিল্ডিং। হাঁ করা মুখ। দাঁতগুলো এক একটা  
কঠিন মাউন্টেন হওয়ার লোভে। ক্ষয়ে ক্ষয়ে। প্রচন্ড প্রশ্বাস। ছবিটা সমুদ্রের হয়ে গেলো।  
এখানে দীর্ঘশ্বাস শক্ত হতে হতে। ঢেউ এর প্রচন্ড কঠিন ত্বক হয়ে গেছে।

রঙ সোনালী। ম্যাটারিয়াল ব্রোঞ্জ। আমি, প্রদর্শনীতে ছিলাম। ছিলাম না।



## এক বন্দিণীর আত্ননাদ - ক্ষীরের পুতুল নহে বাকুদের স্তম্ভ

...সায়ন সরকার

আমি হলাম হত দরিদ্র অবহেলিত এক অভাগিনী ।  
সৃষ্টির তেপান্তরের দিগন্তে শেষ অসুশালী সূর্য আমি ;  
আমার না আছে রত্নখচিত - প্রাচুর্যময় সম্ভার ,  
না আছে কোনো গর্ব , কোনো অহংকার ;  
কোনো প্রতিস্পর্ধায়ুক্ত আমোদ - প্রমোদ ও ভোগ বিলাসিতা ,  
তাইতো আজও আমি অবহেলিত এক অভাগিনী ।  
আমি পবিত্রতার আবেশে মোরা অবগুষ্ঠিত এক নারী,  
আমার স্নেহ চুষনের পরশে আচ্ছাদিত হয় ,  
এই ধরিত্রীর মৃত্তিকা ।  
প্রাণের প্রথম জটিল স্পন্দনে ধ্বনিত হয় আমারই বজ্রবীণা,  
এক যে ছিল রাজার মত, আমি সৃষ্টির উন্মাদনায় ,  
কোনো এক দিন ।  
সৃষ্টি করে ছিলাম এক অসীম জ্ঞানের ফল্লু ,  
সে এক বিরল রত্ন সম্ভার -  
না , সে মণিমানিক্য খচিত রত্ন সম্ভার নহে ,  
পরম শুণ্যাতিত পরম সত্যকে উপলব্ধি জাত :  
প্রকৃত জ্ঞানের এক স্বর্ণাভ সম্ভার ।  
ফল্লুর প্রবাহমান স্রোত চারিতার্থ করে ,  
পরম জ্ঞান পিপাসুদের অতৃপ্তির ,  
পরিতৃপ্তি প্রদান করে তাদের ।  
আমার গৌরবময় চিন্ময়ীরূপে আন্দোলিত হয়,  
গোটা জগৎ সংসার ।  
আমি সেই সংসারের  
ব্রহ্মা - বিষ্ণু - মহেশ্বর ।  
দানে ছিলাম আমি অকুপণ ,  
সত্য - শিব ও সুন্দরের প্রতীক ।  
অব্যবাহিত ভাবে ঘুরে চলল -  
আমারই গৌরবময় রথচক্র ।

কিন্তু এক বিভীষিকা !

কালান্তরে রথচক্রের গতি গেল থমকে ,

পেলাম এক প্রবল ঘর্ষণের পোড়া গন্ধ ;

শুরু হলো বিনাশের খেলা ,

অতর্কিতে একের পর এক ।

প্রাণের শেষ হৃৎস্পন্দন টুকু রক্ষা করলাম

নিজের ।

যেদিকে তাকাই সেই দিকেই ধংসাবশেষ, ভাবি সব- শেষ ।

থমকে গেল সেই ফল্গুর উত্তাল অনাবিল এক স্রোত,

কালের অবিচল নিয়ম শুকিয়ে কাঠ ন্যায় করে দিলো তাকে ।

মুখল ধারায় শুধুই কণিকার ন্যায় জলীয়বিন্দু ।

স্বাবর অস্বাবর ও স্থাপত্যশিল্প সব ওলোট পালোট গেল হয়ে

সবশেষ !!

হল এক অকৃত্রিম লাঞ্ছনা ও অবহেলার সূর্যদয়

ভূতাস্বরূপ পরিচয় -

ঝংকারে ধনিত হয় শুধুই বিলাপ, নিয়তির পরিহাস -

কয়েক বছরের পুতুল খেলার ও বারুদের স্তূপ গঠনের

শেষে যদিও,

উদিত হতে দেখলাম এক নব জীবনের সূর্য -

বিরঙ্গনার সুরময় প্রভাতের পূর্ব উদয় গিরির ভালে,

বেলা গড়াতেই ফিকে হয়েগেলো তা ।

পেলাম সেই অন্ধকারময় মুহূর্তের

অশনিসংকেত ।

চিহ্নিত হয়েই রয়েগেলাম-

অশরীরী রূপের প্রবাহমান ধারিকাস্বরূপ ।

পায়েনি আমার রথচক্র তার নিজস্ব গতি ও হৃন্দ

বয়সের জড়তা ও অন্ধকারময় জীবনের ছাপ,

হয়তো তোমরা এই লেখনীর

হাতের টানেই পর্যবেক্ষণ করেছো ।

ইতিটানার পথের পথিক আমি ,

বিদায় শেষ বেলায় বলি -

আমার বক্ষেই রচিত -  
ভ্রাতায় ভ্রাতায় এক বিরল পরাক্রমতার দুর্ধর্ষ  
এক ইতিবৃত্ত |  
আমার নাম ভারতবর্ষ,  
তোমাদের স্নেহ স্পর্শিত বুলিতে "ইন্ডিয়া "



## শব্দপ্রবাহ-২

...সোহিনী সরকার

Link to song:

[https://drive.google.com/file/d/1d50jp\\_QjpqK2X0pJ0ycACpdEVfwapDCV/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1d50jp_QjpqK2X0pJ0ycACpdEVfwapDCV/view?usp=sharing)



## ইতিহাসের বোদুর

... মৌসুমী চক্রবর্তী

সেভার্ন নদী পেরিয়ে ছুটছিলো  
আমাদের চারপেয়ে বাহন।

সেদিন আমাদের উইক-এন্ড ভ্রমণের গন্তব্যস্থল ছিলো দক্ষিণ ওয়েলসের একটি  
ছোট্ট সুন্দর শহর, ক্যালডিকট আর তার এক প্রান্তে একটি মধ্যযুগীয় দুর্গ।

সেভার্ন নদী থেকে খুব দূরে নয় জায়গাটা। নদীটিও সুন্দর। নামটি পেয়েছে নাকি  
ল্যাটিন শব্দ "সাব্রিনা" থেকে..... সীমানা। গ্রেট ব্রিটেনের এই সবচেয়ে লম্বা জলধারাটি  
এঁকেবেঁকে ওয়েলস ও ইংল্যান্ডের অনেকটাই সীমানা ধরে বয়ে চলেছে.... তাই এই সুন্দর  
নামকরণ।

হাই-ওয়ে ছেড়ে অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তা ধরে এবার এগোচ্ছি আমরা। রাস্তার ধারের  
পথ নির্দেশিকা দেখে দেখে এগোনো। অবশেষে.....

বাহ, বেশ তো জায়গাটি। বেশ... মানে বেশ ঘরোয়া। অনেক সবুজ আস্তানা গেড়েছে  
এখানে সেখানে....জবর দখলের মত। ছবির মত ছোট্ট ছোট্ট কটেজ। লাল টালির ছাদ।  
গেটে আইভি লতা। সামনে পেছনে ফুল-সজ্জীর বাগানে টিউলিপ আর লাল টমেটোর  
উঁকিঝুঁকি।

"ক্যালডিকট"....শহর না বলে জায়গাটার পুচ্ছে "শহরতলী" পদবীটাই মনে হল  
বেশি মানাবে। একসময় ছিলো কৃষিনির্ভর একটি গ্রাম। এখন বসতি বেড়েছে, স্কুল মার্কেট  
সার্জারী ইত্যাদি সবরকম সুযোগ সুবিধা হয়েছে। তাই সে শহুরে সম্মান দাবি করেছে।

সেই সাতসকালে বেরিয়েছি। রাস্তার ধারের একটি পরিচ্ছন্ন রেস্টোরাঁয় অল্প কিছু  
খেয়ে এবার রওনা দিলাম আকাঙ্ক্ষিত দুর্গটির উদ্দেশ্যে।

পথের দুপাশে সবুজের হরেক রকমফের। ঘন সবুজ, শ্যাওলা সবুজ, টিয়া সবুজ,  
জলপাই সবুজ.... মাঝখান দিয়ে সিঁথি কাটা পথ। নির্দেশিকার বেশ কিছু তীর চিহ্ন  
আমাদের সহজেই পৌছে দিল ক্যাসেলের গেটে।

ভাঙা ফটকে, ক্ষয়ে যাওয়া পাথুরে দেয়ালে প্রাচীনত্বের অহংকার। ইতিহাসকে  
সম্মান জানিয়েই দুর্গটির সংরক্ষণ করা হয়েছে। অপ্রয়োজনে আধুনিকতার অনুপ্রবেশ ঘটে  
নি। চারপাশের সবুজ উপত্যকার মাঝে একটুকরো মধ্যযুগের অস্তিত্ব! বেশ লাগছিল  
আমার।

ফটকে দিয়ে ঢুকে একটু এগোতেই দুর্গের স্পাইরাল স্টেয়ারকেস বা ঘুরন্ত সিঁড়িঘর। কী উঁচু উঁচু পাথরের সিঁড়ি রে বাবা! সাবধানে রেলিং ধরে (পরে নির্মিত) আলো-আঁধারির মধ্য দিয়ে ওপরে উঠছি।

দুর্গটি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনার ফাঁকেই লক্ষ্য করলাম, একটি জাপানী পর্যটকের দল, ক্যাসেলের ভেতর কুলুঙ্গি আকৃতির একটি জানালার সামনে ভীড় করেছে। আর তাদেরকে নরম্যান ইতিহাসের গল্প বলে চলেছেন এক বলিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ পুরুষ। ইংরেজদের তুলনায় একটু খাটো। সাবলীল বলার ভঙ্গী। বুঝলাম, দলের গাইড। দলটির পেছনে একটু জায়গা করে নিয়ে দাঁড়াতেই কানে এল যেন ইতিহাসের কণ্ঠস্বর...

"এই জায়গাটা ব্রিস্টল চ্যানেলের খুব কাছেই। তাই জাহাজদের গতিবিধির উপর নজর রাখা খুব সহজ ছিলো। জায়গাটার অবস্থানগত গুরুত্ব বুঝেই এগারশো তিরিশি সালে নরম্যানরা এখানে গভীর পরিখা ঘেরা এই দুর্গটি নির্মাণ করে, যাতে দক্ষিণ ওয়েলসের এই অংশটির উপর তারা দখলদারী বজায় রাখতে পারে।"

দুর্গের ভেতর ঘরের পর ঘর ঘুরছি আমরা। প্রায় প্রতিটি ঘরে বিশালাকৃতি পাথরের ফায়ার প্লেস। একটি ঘরে নরম্যান রাজাদের শিরস্জাণ, বর্ম ইত্যাদি ইতিহাসের গল্প বলে। ঘুরতে ঘুরতে মধ্যযুগের আরও গভীরে ঢুকে পড়ছি....চারপাশে শয়ে শয়ে নরম্যান সৈন্য, পরিখা ঘিরে পাহাড় দিচ্ছে, শত্রুপক্ষের জলযানের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে.... যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সব।

প্রায় ঘন্টা দুয়েক লাগলো পুরো দুর্গটি ঘুরে দেখতে। নেমে এলাম আরেকটি ঘুরন্ত সিঁড়ি দিয়ে.... আবারও অতি সাবধানে।

নেমে দেখি দুর্গের মধ্যখানের চাতালে আছড়ে পড়েছে এক চিলতে রোদুর..... একটু যেন অন্যরকম। পাখি জাগা ভোরের রোদের মত রহস্যময়, পড়ন্ত বিকেলের রোদুরের মত বিষন্ন, আবার দুপুরের রোদের মতই উন্মাসিক দান্তিক..... ইতিহাসের রোদুর।



## বেকার ষ্টাম্প

...সৌম্যদীপ কুণ্ডু

"বয়স কত হল ছেলের"  
জিজ্ঞেস করতেই  
মা বলে উঠলো  
"এই সামনের আষাঢ়েই  
আঠেরো বছর পূর্ণ হবে।।"

কথাটা শুনেই মনে হল  
আঠেরো বছর  
মানে প্রাপ্তবয়স্ক  
মানে নিজের সিদ্ধান্তের মালিক  
আমি নিজেই।।

সত্যিই কী তাই  
না আঠেরো বছর বয়স  
মানে কাঁধে গুরুদায়িত্ব  
বাবার বয়স হচ্ছে  
আর হয়তো কাজ চালাতে পারবে না।।

জয়ন্তর মনে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন  
উচ্চমাধ্যমিকে এক দাঁড়ি পেয়েছে সে  
ভাবছে ঐ পারার শুভ দাদার মতো পড়াশুনা  
করে বিরাট চাকরি করবে,  
বা জনি দাদার মতো টিচার হলেও মন্দ না।।

এসময় হঠাৎ ডাক আসে  
বাবা বলে, "বাবু এবার একটু দোকানটা দেখ  
আর চাকরি খোঁজ একটা"  
মাও বলে ওঠে "দেখ বাবাও আর পারছে না,

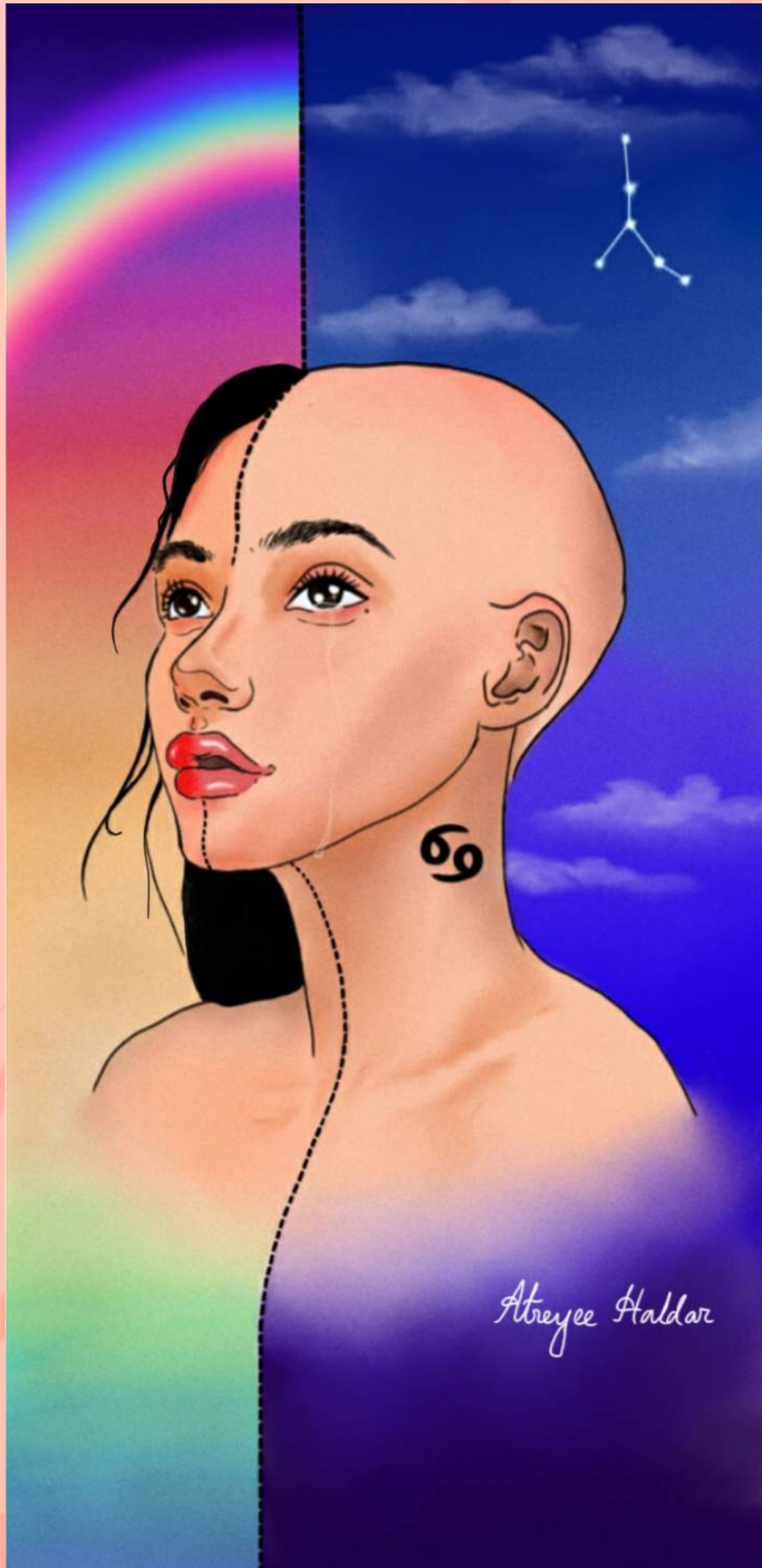
তাকে পড়ানোর টাকাও নেই"।।

কথা শুনে যেন  
আকাশ ভেঙ্গে পড়ে  
জয়ন্তর মাথায়  
সত্যিই কি তার সব চিন্তার  
জলাঞ্জলী হবে এভাবে ।।

কিন্তু কি আর করবে সে  
বাবার কথা মুখ বুজে মেনে নেয় সে,  
ব্যবসায় নেবে পরে  
আর উচ্চমাধ্যমিক পাশ চাকরি  
খুঁজতে থাকে।।

ব্যবসায় মন বসে না  
আর তাই দোকানও লাটে ওঠে  
চাকরি নেই বাজারে  
এই মেধার গায়ে সমাজ  
লাগিয়ে দেয় 'বেকার' স্টাম্প ।।





আত্রেয়ী হালদার

## ক্লাসিক্যাল পোয়েটিক্স ও তার প্রারম্ভিক নির্মাণ

### ...ঐঙ্গিতা

ক্লাসিক্যাল পোয়েটিক্স নির্মাণ ক্ষেত্রে সবার আগে যে গ্রন্থগুলির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যস্বাভাবী সেগুলি হল-

১. অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব
২. হোরসের আর্স পোয়েটিকা
৩. অন দ্য সাবলাইম

এই গ্রন্থগুলি ক্লাসিক্যাল পোয়েটিক্সের সূচনার এক পরিপূর্ণ ধারণা দিতে সক্ষম।

#### ১. অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব:

অ্যারিস্টটলের ‘কাব্যেরশিল্পরূপ’ সম্পর্কিত প্রবন্ধটি সাধারণত কাব্যতত্ত্ব নামে পরিচিত। এতে আবশ্যকীয় ধারণাসমূহ থেকে গেছে অব্যখ্যাত। এতো সব খুঁত থাকা সত্ত্বেও কাব্যতত্ত্ব একটি চিরায়ত গ্রন্থ। এখানে যুক্তিপ্রণালীর বিকাশ ঘটেছে মহিমাময়ভাবে। যুক্তিপ্রণালিটির গুণে কাব্যতত্ত্ব সাহিত্যের শুধু সর্বপ্রথম পুঞ্জানুপুঞ্জ দার্শনিক আলোচনাই হয়নি, হয়ে উঠেছে পরবর্তী আলোচনাসমূহের ভিত্তি। দার্শনিক প্লেটোর কবিসত্তা দার্শনিক সত্তায় মিশে গেছে। তিনি কাব্যে বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, “কাব্য সত্য থেকে বহুদূরে, কাব্য এক ছায়ার ছায়া, কাব্য অসত্য ও অনৈতিক।” তাই প্লেটোর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রে কবির স্থান নেই। অ্যারিস্টটল দীর্ঘকাল ভেবেছেন, প্লেটোর যুক্তিগুলো নিয়ে চিন্তা করেছেন। আর সেই ভাবনাগুলোর পরিণতিই হচ্ছে ‘কাব্যতত্ত্ব’। কাব্যতত্ত্বের সূত্রগুলো গ্রীক সাহিত্যজ্ঞান থেকে উদ্ভূত হয়ে বিশ্বজনীনতা লাভ করেছে। তবে এর মূলে অবশ্যই অ্যারিস্টটলের অন্তর্দৃষ্টি, বিশ্লেষণের প্রতিভা এবং সাহিত্যবোধের গভীরতার কথা স্বীকার করতে হবে। কাব্যতত্ত্ব আলোচনার প্রধান বিষয় ট্রাজেডি ও মহাকাব্য।

এরিস্টটলের কাব্যতত্ত্বের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো ক্লাসিক্যাল পোয়েটিক্স নির্মাণে সাহায্যকারী হয়ে উঠেছে তা হলো,

- ক. শিল্প অনুকরণ: শিল্পে শিল্পে পার্থক্য হয় অনুকরণের মাধ্যমে বিষয়ে অথবা পদ্ধতিতে।
- খ. কাব্যের উদ্ভব ও বিকাশ ট্রাজেডি ও কমেডির সূচনা।
- গ. ট্রাজেডি একটি ষড়শিল্প। কাহিনী, চরিত্র, অভিপ্রায়, ভাষা, সংগীত ও দৃশ্য-এ ছয়টি তার অঙ্গ।



ঘ. কাহিনির গঠন, কাহিনির ঐক্য, কাহিনির শ্রেণিবিভাগ, কাহিনি গঠনের আবশ্যিক উপাদান।

ঙ. ট্রাজেডি বহিরঙ্গ।

চ. ট্রাজেডির পরিণামে আবেদন, করুণা ও ভীতির উদ্বোধন ও আবেগের পরিশোধন হয়।

ছ. চরিত্রের লক্ষ্য চরিত্রের সার্থকতা।

জ. অভিপ্রায়ের সংজ্ঞা নির্ধারণ ও অভিপ্রায়ের সাথে ট্রাজেডির সম্পর্ক।

ঝ. ভাষার ব্যবহার ও ভাষারীতি।

ঞ. মহাকাব্যের আকৃতি ও প্রকৃতি, ট্রাজেডির সঙ্গে তুলনা ও ট্রাজেডির শ্রেষ্ঠত্ব।

ট. মহাকাব্যের সত্য, কাব্য ও ইতিহাসের পার্থক্য।

ঠ. কাব্যের নিজস্ব নিয়ম কাব্যের সমালোচনা পদ্ধতি।

কাব্যতত্ত্বে কমেডি সমন্ধে অল্প কয়েকটি কথা রয়েছে। হয়তো লুপ্ত দ্বিতীয় খন্ডে কমেডি সমন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ছিল। গীতিকবিতা সম্পর্কে এরিস্টটল কোনো কথা বলেন নি।

কাব্যতত্ত্বের অধিকাংশ স্থান জুড়ে উঠে এসেছে ট্রাজেডি ও মহাকাব্যের আলোচনা। তবে ধারণা করা হয়, কাব্যতত্ত্ব শুধু ট্রাজেডিরই আলোচনা, মহাকাব্য উঠে এসেছে ট্রাজেডির সঙ্গে তার পার্থক্য দেখানোর জন্য।

২. হোরেসের আর্স পোয়েটিকা:

সমালোচনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অ্যারিস্টটলের কাব্যনির্মাণ কলার পরেই হোরেস এর এর স্থান। যদিও সময়ের ব্যবধান প্রায় দু' শত বছর। ল্যাটিন সমালোচনা সাহিত্যিক হোরেস এর প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। হোরেস এর সাহিত্যের প্রভাব ইটালীর বাইরে ফ্রান্স, তারপর জার্মানী, পর্যায়ক্রমে স্পেন ও হল্যান্ডসহ বহুদেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। তাঁর সমালোচনা সাহিত্যের প্রভাব অতি দ্রুত বিস্তারিত হতে থাকে। কাব্যধর্মী হলেও 'আর্স পোয়েটিকা' প্রকৃতপক্ষে কাব্যতত্ত্ব। যে বৈশিষ্ট্যগুলি এই গ্রন্থটিকে সমালোচকদের দৃষ্টিগোচর করে তুলেছে তা হল-

ক. কোন শৈলী অবলম্বন করে কাব্য এবং নাটক লেখা উচিত এই পত্রকাব্যে হোরেস তা বর্ণনা করেছেন।

খ. হোরেস তার কাব্যাদর্শে প্রাচীন গ্রিস এবং রোমান ধারার অনুসরণ করেছেন।

গ. কাব্যের ক্ষেত্রে তিনি বিষয় সঙ্গতির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন: কাব্য আদি-মধ্য-অন্ত এই তিনটি পর্বে বিভক্ত থাকবে কিন্তু এগুলি ঐক্যবদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। তিনি কার্যত অ্যারিস্টোতলের কাব্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

ঘ. হোরেস সর্বত্রই তাঁর সাহিত্য-সম্পর্কিত বক্তব্য কল্পনা সমৃদ্ধ কবিতার আঙ্গিকে সন্নিবেশিত করেছেন।

ঙ. কবিতার অনেকগুণ তার সমালোচনার পরিধিতে ধরা না দিলেও সমালোচনামূলক বক্তব্যের অনেক ফাঁকই পূরণ করে দিয়েছে কল্পনা সমৃদ্ধ কাব্যঙ্গিক।

চ. হোরেস এই সমালোচনামূলক রচনাগুলোতে রোমান সাহিত্য সমালোচনার ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন আধারেই কাব্য সম্পর্কিত সময়ে পোষিত কতকগুলো ব্যক্তিগত প্রিয় ধারণা ও মৌলিক বিশ্বাস উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন।

ছ. পদ্য ও কবিতার পার্থক্য নির্ণয়েও তিনি সদাতৎপর ছিলেন।

হোরেসের সাহিত্য সমালোচনা একজন কবি-সমালোচকের ভাবনা জগতে সঞ্চারশীল কিছু নিয়ম নির্ধারক বক্তব্য; কোনো পরিকল্পিত সমালোচনা বিধি প্রণয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে এগুলো প্রকাশ করা হয়নি। এগুলোতে মুখ্যতঃ তার রচনায় প্রতিফলিত কতকগুলো বৈশিষ্ট্যকে স্বচ্ছভাবে, নির্দিষ্ট করে সঙ্গত ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো তাঁর কবিতার চারিত্র্য নির্দেশ যেমন করে, তেমনি অপরাপর কবির সঙ্গে তার মতের ঐক্য ও পার্থক্য নির্দেশ করে।

৩. অন দ্য সাবলাইম:

অন দ্য সাবলাইম খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী অবধি রচিত সকল সাহিত্যের সমালোচনার একটি রোমান যুগের গ্রীক রচনা। এর লেখক অজানা। এটি নন্দনতত্ত্ব এবং ভাল লেখার প্রভাবগুলির উপর একটি ক্লাসিক কাজ হিসাবে বিবেচিত। এই গ্রন্থটিতে পূর্ববর্তী সহস্রাব্দের থেকে ভাল এবং খারাপ লেখার উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে, বিশেষত কী উত্থানের দিকে নিয়ে যেতে পারে তার দিকে মনোনিবেশ করে। এই সকল বিষয় সমালোচকদের কাছে পোয়েটিক্স নির্মাণে সাহায্যকারী হয়ে উঠেছে।

ক. একটি আলোচ্য বিষয় হল যৌক্তিকতা হ্রাস, শিল্পীর সৃজনশীল প্রক্রিয়া এবং পরিচয় এবং উচ্ছ্বাসের সাথে মিশে থাকা গভীর আবেগের সাথে সনাক্তকরণের দিকে পরিচালিত একটি বিচ্ছিন্নতা।

খ. লেখক সাহিত্যের ক্ষয় সম্পর্কেও কথা বলেছেন, যেমন কেবল ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অনুপস্থিতি থেকেই নয়, নৈতিকতার দুর্নীতি থেকেও উদ্ভূত হয়েছিল, যা একসাথে সেই উঁচু আত্মাকে ধ্বংস করে যা উৎসাহ সৃষ্টি করে। সুতরাং এই গ্রন্থটি স্পষ্টতই জ্বলন্ত বিতর্ককে কেন্দ্র করে যা প্রথম শতাব্দীতে লাতিন সাহিত্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

গ. ভাষাতাত্ত্বিক কার্ঠামো যেভাবে লেখকদের অনুভূতি এবং চিন্তাভাবনা নির্ধারণ করে তেমন আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রতি এই গ্রন্থটিও সীমিত।



ঘ. লেখক শব্দের, রূপক এবং ব্যক্তিত্বের বিশদ সমালোচনার উপর আলোকপাত করে প্রাচীন তত্ত্বকে সুস্পষ্টভাবে আক্রমণ করে সেই সময়ের জনপ্রিয় বক্তৃতাগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

ঙ. মূলত, লেখক তাঁর সময়ের সমালোচকদের জন্য বিরল, "প্রযুক্তিগত বিধিগুলির চেয়ে" স্টাইলের মহানুভবতার দিকে বেশি মনোনিবেশ করেন।

## এবং তুমি

...অনীশা ঘোষ

চাঁদের হাসি ছড়িয়ে পড়ে দূরে  
আমার পাড়া তারার আলোয় স্নান;  
রোজ দুপুরে শান্ত নদীর পাড়ে  
তিতাস শোনায় মন-পাহারীর গান।

সেখান থেকে খানিক দূরের পথে  
তোমার বাঁশির সুরের ধ্বনি ভাসে,  
মেঘলা দিনে ঝড়ের হাওয়ার সাথে  
তোমার গায়ের গন্ধ ভেসে আসে।

সেই হাওয়াতে উজান পাবে নদী  
সারিয়ে নেবে সমস্ত রাগ, ক্ষত,  
তবুও শেষে বাঁধ ভেঙে যায় যদি,  
সামলে নিও কান্না আঘাত শত।

সমুদ্রের ঢেউয়ের তালে তালে  
হারিয়ে যাওয়া পথ খুঁজে পাই আমি,  
দিনের শেষে ক্লান্ত চোখ আর গালে  
ছড়িয়ে পড়ুক আদর এবং তুমি।

## ইতি অশ্ব

...অনুপম তরফদার

মহাভারতের যুদ্ধ ও তৎসম্পর্কিত নানান কেচ্ছা-কাহিনী মহর্ষী ব্যাসদেব ও অন্যান্য ঋষিগণ জন সাধারণের মধ্যে নানান ভাবে প্রচারে সক্ষম হয়েছেন। এ সম্বন্ধে বৃহৎ বৃহৎ পুস্তকে যা বর্ণিত হয়নি তা হল পান্ডব আস্তাবলের অন্তঃপুরে কথা। দাসী হিমালীনি ও তার পুত্র শোন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ চলাকালীন সেই আস্তাবলের সমস্ত অশ্বের দেখভালের দায়িত্ব পালন করতেন। শোন বাল্যকাল থেকেই অশ্বভাষায় পারিদর্শী(child prodigy)। আস্তাবলের অন্তঃপুরে অশ্বদের পারস্পরিক সম্পর্ক, তাহাদের বার্তালাপের বিষয়, তাহাদের বিক্রম সবই তার পুত্রাদিদের মধ্যে প্রচার করেন। যুগান্তর ধরে সেই কথা জনপ্রিয় না হলেও একেবারে মুছে যায়নি।

## অসাম্য

ত্রৈতা যুগে কার্লমার্কসের আবির্ভাব না হওয়ায় মনুষ্যদিগের মধ্যেতো অবশ্যই এমনকি আস্তাবলের পঞ্চপান্ডবদের অশ্ব মধ্যেও ছিলো চরম বৈষম্য। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বেরা সর্বাদধিক যন্তুয়াতি ভোগ করিত। তাহাদিগোদের নিয়মিত অনুশ্লেনেও যাইতে হইতেনা। সর্বাধিক অলস ও দুর্বল হওয়া সম্বন্ধে তারা অন্য অশ্বদিগ অপেক্ষা দ্রুত রথ টানিতো কারন অধর্মের ভারে তাহাদিগের রথের চাকা কোনো দিন ভূমি স্পর্শ করে নাই(So no friction, less effort. Basic physics)। প্রায়শই তাহাদের আস্তাবলের বুদ্ধিমান অশ্বদিগো হইতে প্রশ্ন শুনিতো হয়তো, "যদি শূন্যেই ভাসিতে হয় তবে রথে চাকার কী প্রয়োজন?" (আপনি বুদ্ধিমান না আর অশ্বতো না-ই) যুধিষ্ঠিরের অশ্বেরা মুচকি হেসে প্রশ্ন করিতো, "বৎস, যদি রথে চাকাই না থাকিত তাহলে রথকে রথ বলিয়া চিনিতা কেমনে?"



## অশ্বখামা হত

"অশ্বখামা হত, ইতি গজ", যুধিষ্ঠিরের মিথ্যা যারা মহাভারত জানেন তাদের সকলেরি গুণাত যাহা নিম্নরূপঃ  
মিথ্যাবচনের পর যুধিষ্ঠিরের রথের চাকা ভূমি স্পর্শ করে। তার অশ্বেরা প্রথম রথের ভার অনুভব করে। সারথি ক্রমাগত প্রহারের পরেও অশ্ব অনড় দেখিয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন (কবির সুমন যুধিষ্ঠিরের জায়গায় থাকলে হয়তো বলতেন, "হাল ছেড়না বন্ধু, বরং লাগাম টেনে ধর" যাই হোক)। ঘটনাটা সর্বশেষে যাহা দাঁড়াইল তাহা এইরকমঃ

নাকে ক্রোধ, চোখে লাজ

মূর্ছা গেলেন ধর্মরাজ।

"বন্ধ হয়েছে আজ প্রভুর চোখ

এবার অশ্বযুগলের বিনাশ হোক"।

অশ্বযুগলের মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করে সারথী একজন সেনার সাহায্যে যুধিষ্ঠিরকে শূন্যে তুলিয়া তাবুতে নিয়ে যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন।

আস্তাবলে অশ্বেরা বলিলো, " ইহা একদিন হবারই ছিলো না হইলে ভাম্যমান রথে চাকা থাকিবে কেন?"(আসলে Back up, আর কি!)। পরদিন প্রভাতে সেই অশ্বযুগলের ১০৮ বার সাঁড়ে চোদোবার ফাঁসি হইলো এবং যুধিষ্ঠিরের জন্য নতুন বলবাল অশ্ব নিয়োগ করা হইলো।

\*পুরাণে কথিত আছে নীচের গুরুচন্দালী দোষ ধরতে নেই।

## *Meet the editors:*

Aritra Dutta



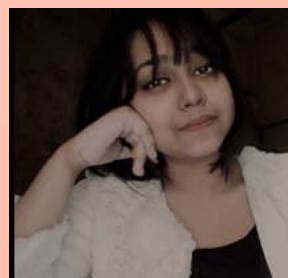
Debarghya Chakraborty



Ipsita Sardar



Atreyee Halder



Sohan Ghosh



Sayak Chakraborty



Rajarshi Chakraborty

